

মুখতার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমূহের সূচী ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)

নাবী (সাঃ) এর নিরাপত্তা চুক্তি, সন্ধি, অমুসলিমদের দূত, জিয়ইয়া গ্রহণ, আহলে কিতাব এবং মুনাফিকদের সাথে তাঁর আচরণ ও ওয়াদা-অঙ্গিকার পূরণ সম্পর্কে

রসূল (ﷺ) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- সকল মুসলিমের অঙ্গিকার ও নিরাপত্তা একই রকম। তাদের সবচেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির অঙ্গিকার এবং নিরাপত্তা প্রদানও পূর্ণ করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের নিরাপত্তা সম্পর্কিত চুক্তি ভঙ্গ করবে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিস্তা এবং সমস্ত মানুষের লা'নত। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। তিনি আরও বলেন- কোন ব্যক্তি এবং কোন গোত্রের মধ্যে যদি চুক্তি থাকে, তাহলে সেই চুক্তি যেন ভঙ্গ না হয়। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে পারে। আর কোন পক্ষ চুক্তির অবসান চাইলে অপর পক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে। যাতে উভয় পক্ষই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়টি সমানভাবে জানতে পারে। নাবী (ﷺ) আরও বলেন- যে ব্যক্তি কোন মানুষকে জানের নিরাপত্তা দেয়ার পর হত্যা করবে, আমি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর থেকে আরও বর্ণনা করা হয় যে, যখনই কোন সম্প্রদায় অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে, তখন তাদের উপর শত্রুকে সবল করে দেয়া হবে।

নাবী (ﷺ) যখন হিজরত করে মদীনায়ে আসলেন, তখন মদীনার কাফেররা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

- একটি দল নাবী (ﷺ) এর সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার হামলা করবেনা এবং তাঁর শত্রুকে তার বিরুদ্ধে সাহায্যও করবেনা। তারা কুফরীসহ তাদের জান ও মাল নিয়ে মদীনায়ে নিরাপদে বসবাস করবে।
- একদল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করল।
- আরেক প্রকার কাফের তাঁর সাথে কোন প্রকার চুক্তি করলনা এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করলনা। তারা তাঁর এবং তাঁর শত্রুদের শেষ পরিণামের অপেক্ষায় থাকল। তবে এই দলের কেউ কেউ মনে মনে তাঁর বিজয় কামনা করত। আবার এদের কেউ তাঁর শত্রুদের বিজয় কামনা করত। এদের মধ্যে আরেক গ্রন্থ ছিল, যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু গোপনে তারা তাঁর শত্রুদের সাথেই ছিল। যাতে তারা উভয় দলের ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকতে পারে। এরাই ছিল মুনাফিক। রসূল (ﷺ) এ সমস্ত কাফেরদের সাথে হুকমে ইলাহী অনুযায়ী কাজকারবার করেছেন।

সুতরাং তিনি মদীনার ইহুদীদের সাথে সন্ধি চুক্তি করলেন এবং তাদের সাথে নিরাপত্তার সনদ রচনা করলেন।

কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর বনু কায়নুকা নাবী (ﷺ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।

কেননা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়কে তারা ভাল চোখে দেখেনি। তাই তারা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করে চুক্তি ভঙ্গ করল।

অতঃপর বনী নযীরের ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করল। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে ঘেরাও করলেন ও তাদের খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাদেরকে মদীনা হতে এই শর্তে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন যে, তারা যুদ্ধোত্তর ব্যতীত উট বোঝাই করে অন্যান্য আসবাব-পত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই কাহিনী সূরা হাশরে উল্লেখ করেছেন।

এরপর বনী কুরায়যার ইহুদীরা অঙ্গিকার ভঙ্গ করল। এরা রসূল (ﷺ) এর ঘোর বিরোধী ছিল এবং কুফরীতে ছিল খুবই মজবুত। এ জন্যই অন্যান্য ইহুদীর তুলনায় এদের বিরুদ্ধে কঠিনতম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

এই ছিল মদীনার ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যবস্থা। তিনি প্রত্যেকটি বড় যুদ্ধের পরপরই ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। বদরের যুদ্ধের পর বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, উহুদের পর বনু নযীরের বিরুদ্ধে এবং খন্দকের পরে বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আর খায়বারের ইহুদীদের আলোচনা একটু পরেই আসছে।

তাঁর পবিত্র সুল্লাত এই ছিল যে, তিনি যখন কোন গোত্রের সাথে চুক্তি করতেন, তখন তাদের কতক লোক যদি সেই চুক্তি ভঙ্গ করত আর কতক লোক সেই চুক্তি বহাল রাখত এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন। যেমন তিনি করেছিলেন বনী কুরায়যা, বনী নযীর এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে। এই ছিল চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ) এর পবিত্র সুল্লাত।

ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামদের মতে যিম্মীদের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[1] ইমাম শাফেঈর ছাত্রগণ এই মতের খেলাফ করেছেন। তারা বলেন, যারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, কেবল তাদের সাথে তা ভঙ্গ করা যাবে, অন্যদের সাথে নয়। যারা অঙ্গিকার রক্ষা করবে তাদের সাথে অঙ্গিকার রক্ষা করা জরুরী। শাফেঈগণ উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন যে, অঙ্গিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যাম (রহঃ) বলেন- যখন সিরিয়ার খৃষ্টানরা মুসলমানদের সম্পদ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল, তখন অন্যান্য খৃষ্টানরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েও মুসলিম শাসককে জানায়নি; বরং তারা খৃষ্টানদের কাজকেই সমর্থন করল। কিন্তু শাসক বিষয়টি জানতে পেরে আলেমদের কাছে যখন ফতোয়া চাইলেন, তখন আমরা ঐ খেয়ানতকারীদের ব্যাপারে শাসককে ফতোয়া দিলাম যে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, যারা এতে সহায়তা করেছে এবং যারা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে এদের সকলকেই হত্যা করতে হবে। এদের ব্যাপারটি শাসকের ইচ্ছাধীন নয়, হত্যাই একমাত্র তাদের শাস্তি।

ইসলামের বিধিবিধান মেনে নিয়ে যে সমস্ত যিম্মী নিরাপত্তার অঙ্গিকার নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে, তারা যদি এমন কোন অপরাধ করে, যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, তাহলে ইসলাম তাকে মৃত্যুদণ্ড হতে রেহাই দিবে না।

কিন্তু হারবী তথা যুদ্ধরত কোন কাফের যদি ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তার হুকুম সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ তখন তাকে হত্যা করা যাবে না। চুক্তি ভঙ্গকারী যিম্মীর হুকুম আলাদা। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের উক্তি হতে এটিই সুস্পষ্ট হয়েছে। আমাদের শাইখ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) অনেক স্থানেই এই ফতোয়া দিয়েছেন।

নাবী (ﷺ) যখন কোন গোত্রের সাথে চুক্তি করতেন, তখন তাদের সাথে তাঁর অন্যান্য শত্রুরাও শরীক হত। তাঁর

সাথেও অন্য কাফেররা এসে যোগ দিত। এতে করে যারা তাঁর সাথে যোগদানকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বলেই ধরে নেওয়া হত। এই কারণেই তিনি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং কুরাইশদের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই চুক্তিতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে যোগ দিল। আর খোযাআ গোত্র যোগ দিল রসূল (ﷺ) এর সাথে। পরবর্তীতে বনু বকর গোত্র রাতের অন্ধকারে খোযাআ গোত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাদের কতককে হত্যা করল। কুরাইশরাও গোপনে বনু বকরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল। তাই নাবী (ﷺ) মক্কার কুরাইশদেরকে অঙ্গিকার ও চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে গণনা করলেন এবং বনু বকর ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে হামলা করে মক্কা জয় করলেন।

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) পূর্বাঞ্চলের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। কারণ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে সাহায্য করেছিল এবং অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা যুগিয়ে ছিল। এ জন্যই তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিশ্মীরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহিরসূত মুশরিকদেরকে সাহায্য করে তাহলে তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গকারী এবং বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সাব্যস্ত করা হবে না কেন?

নাবী (ﷺ) এর কাছে তাঁর শত্রুদের দূতগণ আগমণ করত। তাঁর প্রতি তাদের শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দূতদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতেন না। যখন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাবের পক্ষ হতে দু'জন প্রতিনিধি রসূল (ﷺ) এর দরবারে আগমণ করল তখন রসূল (ﷺ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- মুসায়লামার ব্যাপারে তোমাদের আকীদাহ (বিশ্বাস) কী? তারা বলল- সে যেমন দাবী করে তেমনই। তখন রসূল (ﷺ) বললেন- দূতগণকে হত্যা করা যদি দোষণীয় না হত তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। এখান থেকেই দূতদেরকে হত্যা না করার সুন্নাহ জারী হল।

তাঁর পবিত্র সুন্নাহ এই ছিল যে, অমুসলিমদের কোন দূত যদি তাঁর কাছে এসে ইসলাম কবুল করত, তাহলে তিনি তাকে রেখে দিতেন না; বরং প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠাতেন। যেমন আবু রাফে (রাঃ) বলেন- মক্কার কুরাইশরা আমাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট পাঠাল। আমি যখন তাঁর নিকট হাজির হলাম তখন আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হল। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি ফেরত যেতে চাইনা। রসূল (ﷺ) তখন বললেন- আমি অঙ্গিকার ভঙ্গ করিনা এবং দূতগণকে আটকিয়ে রাখিনা। তুমি তাদের কাছে ফেরত যাও। সেখানে যাওয়ার পরেও যদি তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা অনুভব হয়, তাহলে পুনরায় ফেরত এসো।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন- এটি ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন নাবী (ﷺ) ও কুরাইশদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চলছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, মক্কাবাসী কোন লোক মুসলমান হয়ে মদীনাতে আসলে তাকে মক্কাতে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এরূপ করা যাবে না। রসূল (ﷺ)-এর বাণী, 'আমি দূতকে আটকিয়ে রাখিনা'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। মুসলমান হয়ে কেউ আসলে তাঁকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় দূতদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা।

তাঁর অনুমতি ছাড়াই কোন একজন সাহাবীর সাথে তাঁর শত্রুরা যদি এমন কোন চুক্তি করত, যাতে মুসলমানদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই, তাহলে তিনি সেই চুক্তি ও অঙ্গিকার বহাল রাখতেন। যেমন হুযায়ফা ও তার পিতার সাথে শত্রুরা এই মর্মে চুক্তি ও অঙ্গিকার করেছিল যে, তোমরা দু'জন রসূল (ﷺ)-এর সাথে যোগ দিয়ে

আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেনা। নাবী (ﷺ) এই অঙ্গিকার বহাল রাখলেন এবং হুয়ায়ফা ও তার পিতাকে বললেন- তোমরা ফেরত যাও। তারা তোমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছে আমরা তা রক্ষা করব। আমরা তাদের মুকাবেলায় কেবল আল্লাহর সাহায্য চাই।

তিনি কুরাইশদের সাথে দশ বছর মেয়াদী (যুদ্ধ বিরত থাকার) চুক্তি করলেন। তাতে এই শর্ত রাখা হয়েছিল যে, মক্কাবাসীদের কেউ যদি মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট আগমন করে তাহলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। আর মদীনার কেউ যদি মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করে মক্কাবাসীগণ তাকে ফেরত দিবেনা। চুক্তিতে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই शामिल ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের বিষয়টি রহিত করে দিলেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার আদেশ দিলেন। তাদেরকে মুমিন মহিলা হিসাবে জানা গেলে তাকে আর কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া হতনা। শুধু কাফেরের সাথে বিবাহের সময় ঐ নারীকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয়া হত।

আর কোন মুশরিকের স্ত্রী মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসলে তিনি মুসলিমদেরকে আদেশ দিতেন, তারা যেন সেই মহিলার বিবাহের মোহরানা তাঁর মুশরিক স্বামীকে ফেরত দেয়। সুতরাং তারা মুহাজির মুমিন মহিলার মোহরানা তার কাফের স্বামীর নিকট ফেরত পাঠাতেন। তাকে তার মুশরিক স্বামীর নিকট ফেরত পাঠানো হতনা। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, স্বামীর মালিকানা থেকে বের হয়ে আসতে চাইলে মহিলার পক্ষ হতে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর সেটি হচ্ছে সেই মোহরানা, যা বিবাহের সময় নির্ধারিত হয়েছিল। মহরে মিঞ্জল (মহিলার খালা বা ফুফুর জন্য সেই পরিমাণ মোহরানা নির্ধারিত হয়েছে তা) নয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কাফেরদের বিবাহ-সাদীও বিশুদ্ধ এবং শর্তের মধ্যে লিখা থাকলেও হিজরতকারী মুসলিম মহিলাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া যাবেনা। আরও জানা গেল যে, কোন মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম কাফেরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয় এবং ইদ্দত পার হয়ে যাওয়ার পর মোহরানা পরিশোধ করে হিজরতকারী মহিলাকে বিবাহ করা মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ।

এতে আরও সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, হিজরতের মাধ্যমেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্ত্রীর উপর থেকে কাফের স্বামীর মালিকানা সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়। মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বিধানগুলো কুরআনের আয়াত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর উপর কতক আলেমদের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। আর কতক মাসআলায় আলেমদের মতবিরোধও রয়েছে। যারা বলে এগুলো রহিত হয়ে গেছে, তাদের কাছে কোন দলীল নেই।

কেননা নাবী (ﷺ) এবং মুশরিকদের মধ্যে যেই শর্ত ছিল, তাতে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় আসলে তাকে ফেরত দেয়ার কথা ছিল। তবে পুরুষদের সাথেই বিষয়টি সম্পৃক্ত ছিল। মহিলারা এই শর্তের আওতায় ছিলনা। তাই মুসলমান হয়ে কোন মহিলা চলে আসলে তাকে ফেরত দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

নাবী (ﷺ) শুধু মোহরানা ফেরত দেয়ার আদেশ করেছেন। যার স্ত্রী মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসবে সে ঐ পরিমাণ মোহরানা ফেরত পাবে, যা সে তাঁকে বিবাহের সময় প্রদান করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিধান, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও হিকমতের আলোকেই এই ফয়সালা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এই হুকুমের বিপরীতে অন্য কোন হুকুম নাযিল হয়নি।

নাবী (ﷺ) যখন কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করলেন তখন তিনি কুরাইশদের জন্য এই সুযোগ দিয়ে

রেখেছিলেন যে, তাদের নিকট থেকে যে তাঁর কাছে চলে আসবে তারা তাকে ফেরত নিতে পারবে, তবে তিনি কাউকে ফেরত যেতে বাধ্য করতেন না বা আদেশও দিতেন না। আর সেই আগত ব্যক্তি যখন কাউকে হত্যা করে ফেলত কিংবা কারও মাল ছিনতাই করে নিয়ে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেত এবং মুসলমানদের সাথেও এসে যোগ দিত না, তখন তিনি এর কোন প্রতিবাদ করতেন না এবং তার দ্বারা কৃত অপরাধের ক্ষতি পূরণ দেয়ার কোন দায়-দায়িত্ব বহন করতেন না। কারণ সে তার কর্তৃত্বাধীন ছিল না। তিনি তাকে ক্ষতি পূরণ দেয়ার হুকুমও দেন নি। কেননা জান ও মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে নাবী (ﷺ) যেই চুক্তি তাদের সাথে করেছিলেন, তা কেবল তাঁর অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। যেমন তিনি বনী জুযায়মার ঐ সমস্ত জান ও মালের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, যা খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে নষ্ট হয়েছিল। সেই সাথে তিনি খালেদ বিন ওয়ালিদের কাজকর্মকে অপছন্দ করেছেন এবং তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

নাবী (ﷺ) এর আদেশে খালেদ (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর খালেদ (রাঃ) যেহেতু তাবীল করে (ইজতেহাদ) করে এরূপ করেছিলেন, কারণ তারা সরসুরি এটি বলেনি যে, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি; বরং তারা বলেছিল- আমরা সাবে হয়ে গেছি অর্থাৎ পূর্বের দ্বীন পরিত্যাগ করেছি। এ কারণেই খালেদ (রাঃ) তাদের ইসলামের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি তাবীল ও সন্দেহের কারণে তাদেরকে অর্ধেক দিয়ত দিয়েছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে তিনি আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানদের বিধান জারী করেছেন। কেননা তারা অঙ্গিকার ও চুক্তির ভিত্তিতে জান-মালের নিরাপত্তা পেয়েছিল; ইসলামের মাধ্যমে নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দাবী এটিও ছিল না যে, তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরের কোন শক্তি যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সেই আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। এই ঘটনায় আরও প্রমাণ রয়েছে যে, ইমামের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোন লোক যদি চুক্তিবদ্ধ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সেই শত্রুকে প্রতিহত করা কিংবা সেই শত্রু যা ধ্বংস করবে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ইমামের উপর আবশ্যিক নয়, যদিও সে মুসলিম হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, যুদ্ধ, চুক্তি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতেহাদের আশ্রয় নেয়ার চেয়ে নাবী (ﷺ) এর সুন্নাত থেকে সমাধান গ্রহণ করা অনেক উত্তম। এর উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, মুসলমানদের কোন বাদশাহ ও তাঁর রাজ্যে বসবাসকারী যিম্মীদের মধ্যে যখন চুক্তি হবে তখন অন্য এমন বাদশাহ সেই যিম্মীদের বিরুদ্ধে হামলা করতে পারবে, যাদের সাথে তার কোন চুক্তি নেই।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) আবু বসীরের ঘটনাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে মালটা অঞ্চলের নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন। খায়বারবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার পর তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করলেন যে, তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হবে এবং তাদের উটগুলো যা বহন করতে সক্ষম সে পরিমাণ জিনিষ-পত্র বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। এ ছাড়া স্বর্ণ-রৌপ্য এবং যুদ্ধের হাতিয়ার রসূল (ﷺ) এর মালিকানাতেই থাকবে। চুক্তিতে আরও শর্ত ছিল যে, তারা তাদের কোন বস্তুই গোপন করতে ও লুকাতে পারবেনা। যদি তারা কোন কিছু গোপন করে তাহলে তাদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিল থাকবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতারের সম্পদ লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নাবী (ﷺ) হুআই বিন আখতারের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নাবী (ﷺ) হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাঃ) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর

(রাঃ) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা পেয়ে গেলেন। অতঃপর আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুআইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী। সুতরাং রসূল (ﷺ) তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করলেন। তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ইহুদীরা বলল- আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন। আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব। কারণ আমরা এখানের ভূমি সম্পর্কে অধিক অবগত আছি। ঐ দিকে নাবী (ﷺ) এর হাতে এমন জনশক্তিও ছিলনা, যারা সেখানকার ভূমি দেখা-শুনা করবে ও চাষাবাদ করবে। তাই তিনি সেখানকার জমি তাদের জন্য এই শর্তে ছেড়ে দিলেন যে, উৎপাদিত সকল ফল ও ফসলের অর্ধেক তারা পাবে আর বাকী অর্ধেক রসূল (ﷺ) এর কাছে সোপর্দ করবে। তারা যত দিন ইচ্ছা ততদিন সেখানে বসবাস করতে পারবে। নাবী (ﷺ) তাদের সকলকে হত্যা করেননি। কিন্তু বনী কুরায়যার সকলেই যেহেতু অঙ্গীকার ভঙ্গ শরীক ছিল, তাই তিনি তাদের সকলকেই হত্যা করেছিলেন।

কিন্তু খায়বারের বনী নযীরের লোকদের মধ্যে হতে যারা মশকটি সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তা গোপন করেছিল তিনি কেবল তাদেরকেই হত্যা করেছেন। বনী নযীরের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা রসূল (ﷺ) কে শর্ত দিয়েছিল যে, তাদের কেউ কোন কিছু গোপন করলে তার জন্য নিরাপত্তার অঙ্গীকার বহাল থাকবেনা। সুতরাং তিনি তাদেরকে শর্ত ভঙ্গ করার কারণেই হত্যা করেছিলেন। খায়বারবাসীর সকলকে হত্যা করেননি। কেননা তাদের সকলেই মশকের (কলসীর) বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলনা। এটি ঐ যিম্মী তথা নিরাপত্তার অঙ্গীকার নিয়ে বসবাসকারীর মতই যে নিরাপত্তা সম্পর্কিত চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং অন্য কেউ তার সাথে শরীক ছিলনা।

অর্ধেকের বিনিময়ে যমীন চাষ করতে দেয়ার মধ্য ভাগে চাষাবাদ করা জায়েয আছে। চাই তা খেজুর গাছের ক্ষেত্রে হোক বা অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে হোক। এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা কোন বিষয়ের হুকুম তার অনুরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং যে সমস্ত দেশে আগুর ফল উৎপন্ন হয় সে সমস্ত দেশের হুকুম খেজুর বিশিষ্ট যমীনের মতই।

এই ঘটনায় আরও দলীল রয়েছে যে, যমীনের মালিকের উপর ভাগে চাষাবাদকারীর জন্য বীজ সরবরাহ করা জরুরী নয়। কেননা নাবী (ﷺ) খায়বারবাসী ইহুদীদের জন্য চাষাবাদের বীজ সরবরাহ করেননি। কতক আলেম বলেছেন- চাষীর উপর বীজ সরবরাহ করার শর্ত চাপিয়ে দেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা নাবী (ﷺ) এর সুনাত এটিই প্রমাণ করে। তিনি খায়বারবাসীর জন্য বীজ সরবরাহ করেননি। যারা বীজ সরবরাহ করার বিষয়টি যমীনের মালিকের উপর চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল নেই। তারা শুধু মুসাকাত তথা ভাগে যমীন চাষ করাকে মুদারাবাত তথা একজনের অর্থ দিয়ে অন্যের ব্যবসা করার উপর কিয়াস করেছেন।

তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে যমীনের মালিক কিংবা চাষী উভয়েই বীজ সরবরাহ করতে পারে। এটি কারও সাথে খাস নয়।

খায়বারের ঘটনায় আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সুনির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ না করেও শত্রুদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করা জায়েয। বিষয়টি ইমামের ইচ্ছাধীন থাকবে। চুক্তি বাতিল করার মত কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে তিনি যতদিন ইচ্ছা চুক্তি বহাল রাখবেন। তবে এমন পরিস্থিতিতে ইমাম শত্রুপক্ষকে চুক্তির পরিসমাপ্তির বিষয়টি না জানিয়ে যুদ্ধের প্রতি অগ্রসর হতে পারবেনা। যাতে করে উভয় পক্ষের লোকেরাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার

বিষয়টি জানতে পারে।

এই ঘটনায় আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া জায়েয। আল্লাহ তা'আলা হুআই ইবনে আখতাবের গুপ্তধন সম্পর্কে তাঁর রসূলকে বিনা মাধ্যমে জানিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু তা না করে তিনি অনুসন্ধানের মাধ্যমে অভিযুক্তকে সনাক্ত করে তাদের শাস্তির বিধান তৈরীর ইচ্ছা করেছেন এবং উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ ও সহজ করার জন্য বিভিন্ন হুকুম-আহকাম উদারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় আরও প্রমাণ মিলে যে, দাবী সঠিক হওয়ার পক্ষে আলামত ও লক্ষণাদি দ্বারাও দলীল গ্রহণ করা জায়েয। কেননা রসূল (ﷺ) বলেছেন- মাল তো ছিল প্রচুর। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কিভাবে?

আল্লাহর নাবী সুলায়মান (আঃ)ও ঐ শিশুর প্রকৃত মাকে সনাক্ত করার জন্য তাই করেছিলেন, যার মালিকানা দাবী করেছিল দুইজন মহিলা। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, একবার দুই মহিলার দু'টি শিশুর একটিকে বাহে নিয়ে গেল। অবশিষ্ট শিশুটিকে নিয়ে উভয় মহিলা টানা-টানি শুরু করল। পরিশেষে ফয়সালায় জন্য দাউদ (আঃ) এর নিকট যাওয়া হল। তিনি উভয় পক্ষের কথা-বার্তা শুনে জোরালো দাবীর কারণে বড় মহিলাটির পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিলেন। মহিলা দু'টি বের হয়ে আসার সময় সুলায়মান (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন- আল্লাহর নাবী দাউদ (আঃ) তোমাদের মাঝে শিশুটির ব্যাপারে কি ফয়সালা করেছেন? তারা উভয়ে ফয়সালায় বিষয়টি জানালো।

সুলায়মান (আঃ) বললেন- তোমরা চাকু নিয়ে আস। আমি শিশুটিকে দুইভাগ করে তোমাদের উভয়ের মাঝে ভাগ করে দিবো। এ কথা শুনে ছোট মহিলাটি বলল- আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! এরূপ করবেন না। শিশুটি তাকেই দিয়ে দিন। সুলায়মান (আঃ) ছোট মহিলার অন্তরে শিশুটির প্রতি দয়া-মায়া দেখে বুঝতে পারলেন যে, সেই শিশুটির প্রকৃত মা। তাই তিনি এর ভিত্তিতেই ফয়সালা করলেন এবং ছোট মহিলার নিকটই শিশুটিকে সোপর্দ করে দিলেন। শুধু মুখে মুখে আলোচনার জন্য নাবী (ﷺ) আমাদেরকে এই ঘটনা শুনান নি; বরং বিচার-ফয়সালায় ক্ষেত্রে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই তা শুনিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়তে হত্যার ঘটনায় বাদী পক্ষের (সাক্ষী না থাকলে) শপথের উপর ভিত্তি করেই ফয়সালায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটিই দাবী সঠিক হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত। এমনি স্বামী যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে উভয়ের মাঝে লিআনের ব্যবস্থা করা হলে স্বামীর সাক্ষ্য দেয়ার (পাঁচবার আল্লাহর নামে শপথ করার) পর স্ত্রী যদি অনুরূপ করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীকে রজম করার বিধান রাখা হয়েছে। কারণ এটি তার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আলামত।

সফর অবস্থায় যদি কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং অসীয়াত করার সময় যদি কোন মুসলিম পাওয়া না যায়, তাহলে আহলে কিতাব তথা অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে মৃতের ওয়ারিছরা পরবর্তীতে সাক্ষীদের পক্ষ হতে যদি কোন বস্তু খিয়ানতের কথা জানতে পারে তাহলে তাদের শপথ করার এবং শপথের মাধ্যমে সেই বস্তুর হকদার হওয়ার অধিকার রয়েছে। ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা ও আলামতের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা ও খুনের ব্যাপারে এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; বরং তাতে প্রবল ধারণা ও বাহ্যিক আলামতের ভিত্তিতে ফয়সালা করার প্রয়োজন আরও বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কারও মাল চুরি হলে সে যদি সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তির হাতে সেই মালের অংশ বিশেষ দেখতে পায় এবং সে কারও কাছ থেকে সেই মাল ক্রয় করেছে বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে সে এই মর্মে শপথ করতে পারবে যে, অবশিষ্ট সম্পদ সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছেই রয়েছে এবং সে তা চুরি করেছে। কারণ এখানে চুরির আলামত সুস্পষ্ট।

কেননা আলামত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট উক্ত বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে।

হত্যা সম্পর্কিত বিষয়েও একই কথা। সেখানেও আলামত ও বাহ্যিক কারণাদির উপর নির্ভর করে ফয়সালা করা জায়েয। বিশেষ করে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা যখন বলবে যে, অমুক অমুক লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। মাল সম্পর্কিত বিষয়ে তা আরও সহজ। একজন সাক্ষী একটি শপথের মাধ্যমে এবং একজন পুরুষ সাক্ষী ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর মাধ্যমে মাল সম্পর্কিত হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ খুনের ব্যাপারটি ভিন্ন। খুনের ক্ষেত্রে যেহেতু আলামতের উপর নির্ভর করে ফয়সালা দেয়া যায় তাই সম্পদের ক্ষেত্রে এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেয়া অধিক উপযোগী ও উত্তম।

কুরআন ও সুন্নাহ এ বিষয়ের (আলামতের) উপর নির্ভর করার প্রমাণ বহন করে। যারা বিষয়টি রহিত হয়ে যাওয়ার দাবী করে তাদের হাতে কোন দলীল নেই। কেননা বিষয়টি সূরা মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা। এতে বর্ণিত বিষয়াদি দিয়ে সাহাবীগণও বিচার-ফয়সালা করেছেন।

ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনার সাক্ষী ও কারীনা তথা আলামত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই দলীল গ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে বলেছিল- ইউসুফ (আঃ) এর কাপড় যদি পিছনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহলে তিনি সত্যবাদী এবং মহিলাটি মিথ্যুক। বাস্তবে দেখা গেল, তাঁর কাপড় পিছনের দিকে ছেঁড়া ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মহিলাকে পিষ্ঠ প্রদর্শন করে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিলেন। মহিলাটি পিছনের দিক থেকে কাপড় ধরে টান দেয়াতে কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। এতে মহিলার স্বামী এবং উপস্থিত লোকেরা ইউসুফ (আঃ) এর নির্দোষিতার প্রমাণ পলেন। তাই মহিলাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হল এবং তাকে তাওবা করার আদেশও দেয়া হল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই ঘটনা শুধু পাঠ করে আনন্দ পাওয়ার জন্য উল্লেখ করেননি; বরং এ থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই তা উল্লেখ করেছেন।

রসূল (ﷺ) যখন খায়বার বাসীকে নির্ধারিত শর্তে সেখানে থাকতে দিলেন তখন প্রত্যেক বছর ফল কাটার সময় হলে একজন অনুমানকারীকে পাঠাতেন। তিনি অনুমান করে দেখতেন যে, কি পরিমাণ ফল হতে পারে। অনুমান করার পর মুসলমানদের অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হত। বাকী অংশ তারা ভোগ করত। রসূল (ﷺ) মাত্র একজন অনুমানকারী পাঠাতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খেজুরের মত অন্যান্য ফলও অনুমান করে ভাগ করা জায়েয আছে। অনুমানের ভিত্তিতেই অংশীদারের অংশ নির্ধারিত হয়ে যেত। যদিও ফল বড় হওয়া ও পাকার জন্য গাছেই রেখে দেয়া হত।

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, শুধু আলাদা করার জন্য অনুমানের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়; বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। খায়বারের ঘটনায় আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনুমানের পর যখন অংশীদারের অংশ নির্ধারিত হবে তখন যার নিয়ন্ত্রণে ফল থাকবে সে তা দেখা-শুনা করতে পারবে।

অতঃপর উমার (রাঃ) এর যামানায় যখন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) খায়বারে তাঁর মালামালের খোঁজ-খবর নিতে গেলেন তখন ইহুদীরা তাঁর উপর আক্রমণ করল এবং তাঁকে ঘরের ছাদ থেকে ফেলে দিল। এতে তাঁর এক হাত ভেঙ্গে গেল। এই ঘটনার পর তিনি সেখানকার ইহুদীদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন এবং খায়বারের সম্পদ হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

[1] - ইসলামী রাষ্ট্রের ঐ সমস্ত অমুসলিম নাগরিকদেরকে যিস্মী বলা হয়, যারা ইসলামী হুকুমত মেনে নিয়ে, কর প্রদান করে এবং ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিবিধান মেনে নিয়ে মুসলিমদের সাথে বসবাস করে।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3925>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন